মানব শারীরতত্ত্ব: প্রজনন
HUMAN PHYSIOLOGY: REPRODUCTION

ইউনিট ৯

সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানুষের জন্ম রহস্য নিয়ে ছিল এক অপার বিস্ময়। কৌতূহলি মানুষকে তার জীবনের সূচনা ও যোগসূত্রের ইতিবৃত্ত জানার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে বহু পথ। জীববিজ্ঞানের কল্যাণে মানব জীবনের ধারাবাহিকতায় উন্মোচিত হয়েছে মানবসত্তা টিকিয়ে রাখার বিভিন্ন প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়ার অন্যতম ও সার্বজনীন সোপান হলো প্রজনন (Reproduction)। প্রজনন এর আভিধানিক অর্থ বংশবিস্তার। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ তার নিজস্ব অস্তিত্ব বা প্রতিলিপি পরিবেশে বা প্রকৃতিতে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। জীবের প্রজনন সংক্রান্ত কিছু বিষয় আপনারা আগের শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেছেন। প্রজননের সাথে জড়িত সকল জীবনগত প্রক্রিয়াসমূহ জীবের জন্য স্বেচ্ছা প্রণোদিত এবং অলঙ্ঘনীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। মানব জীবনের পথ পরিক্রমায় প্রজননতন্ত্র, এর বিভিন্ন পর্যায়, গর্ভাবস্থা, গর্ভনিরোধক পদ্ধতি, প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যাবলি এবং এর সাথে জড়িত কিছু রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার আলোচনাই হবে এ ইউনিটের মূল লক্ষ্য।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ–

পাঠ ৯.১ : পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও হরমোনের প্রভাব
পাঠ ৯.২ : স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও হরমোনের প্রভাব
পাঠ ৯.৩ : প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা
পাঠ ৯.৪ : গর্ভাবস্থায় সমস্যা ও করণীয় দিকসমূহ
পাঠ ৯.৫ : জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ
পাঠ ৯.৬ : যৌনবাহিত রোগসমূহের লক্ষণ ও প্রতিকার

পাঠ-৯.১ পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও হরমোনের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পুরুষ প্রজননতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পুরুষ সেক্স হরমোনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	এপিডিডাইমিস, নালি বা ভাস ডিফারেন্স, সেমিনাল ভেসিকল

পুরুষ প্রজননতন্ত্রঃ যে যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রাণু উৎপাদন, শুক্রাণু জমা রাখা, পবিরহন ও দেহ থেকে বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয় সে তন্ত্রকে পুরুষ (পুং) প্রজননতন্ত্র বলে। মানব পুংজননতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত-

১। শুক্রাশয় (Testis), ২। অণ্ডকোষ (Scrotum), ৩। এপিডিডাইমিস (Epididymis), ৪। শুক্রনালি বা ভাস ডিফারেন্স (Vas deferens), ৫। সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle), ৬। ক্ষেপণ নালি (Ejaculatory duct), ৭। মূত্রনালি (Urethra), ৮। শিশ্ন (Penis), ৯। গ্রন্থিসমূহ (Glands)।

১। শুক্রাশয়- পুরুষ প্রজননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গের নাম শুক্রাশয়। এদের সংখ্যা একজোড়া। দেহগহ্বরের বাইরে স্ক্রোটাম (Scrotum) বা অণ্ডকোষের ভেতর শুক্র রজ্জz (Spermatic duct) দ্বারা শুক্রাশয়দ্বয় ঝুলন্তভাবে অবস্থান করে। প্রতিটি শুক্রাশয় তিনটি আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় ২০০-৩০০টি ছোট ছোট খণ্ডাংশ বা লোবিউলে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ডাংশ ২-৩টি সূক্ষ্ম পাকানো সুতার মত সেমিনিফেরাস নালিকা এবং ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। সেমিনিফেরাস নালিকার অন্তঃপ্রাচীরে শুক্রাণু মাতৃকোষ এবং সারটোলি কোষ অবস্থিত।

কাজ- ক। শুক্রাশয় শুক্রাণু উৎপাদন করে, খ। এটি টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ করে।

২। অণ্ডকোষ- উদরীয় গহ্বরের বাইরে যে থলির অভ্যন্তরে শুক্রাশয় অবস্থান করে তাকে অণ্ডকোষ বলে। স্ক্রোটাম ভেতরের দিকে অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত হয়ে শুক্রাশয়দ্বয়কে পৃথক রাখে।

কাজ- স্ক্রোটাম শুক্রাণু উৎপন্নের অনুকূল তাপমাত্রা রক্ষা করে।

৩। এপিডিডাইমিস- এপিডিডাইমিস কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় শুক্রাশয়ের পিছনের গাত্রে লাগানো থাকে। এপিডিডাইমিসের শেষ প্রান্ত ভাস ডিফারেন্সের সাথে যুক্ত।

কাজ- ক। শুক্রাণুগুলো এখানে মাসাধিক কাল সঞ্চিত থাকতে পারে, খ। এটি শুক্রাণুর চলন শক্তি এবং নিষেক ক্ষমতা বা উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

৪। শুক্রনালি- এপিডিডাইমিসের শেষ প্রান্ত থেকে বের হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন নালিকা হিসেবে মূত্রথলির নিচে সেমিনাল ভেসিকলের নালির সাথে যুক্ত হয়।

কাজ- ক। ভাস ডিফারেন্স সঙ্গমের সময় দ্রুত শুক্রাণু পরিবহন করে, খ। কিছু সময়ের জন্য শুক্রাণু জমা রাখাও এর কাজ।

৫। সেমিনাল ভেসিকল- মূত্রথলির নিম্নপ্রান্ত ও মলাশয়ের মাঝখানে অবস্থিত একজোড়া ক্ষুদ্র থলিকে সেমিনাল ভেসিকল বলে।

কাজ- ক। সিমেন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পিচ্ছিল পদার্থ ক্ষরণ করে, খ। শুক্রাণুকে পুষ্টিদানের জন্য ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ পদার্থ সৃষ্টি করে।

৬। ক্ষেপণ নালি- সেমিনাল ভেসিকল এবং ভাস ডিফারেন্স বা শুক্রনালি একত্রে মিলিত হয়ে ক্ষেপণ নালি তৈরি করে। এটি প্রোস্টেট গ্রন্থির ভিতর দিয়ে মূত্রনালিতে উন্মুক্ত হয়।

কাজ- ক্ষেপণ নালির মাধ্যমে সেমিনাল ভেসিকলের ক্ষরণসহ শুক্রাণু ইউরেথ্রায় প্রবেশ করে।

৭। মূত্রনালি- এটি রেচনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রের একটি সাধারণ নালি। এটি মূত্রথলি থেকে শুরু করে শিশ্নের শেষ মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত।

কাজ- এ নালির মাধ্যমে বীর্য বাইরে স্খলিত হয় এবং মূত্র বের হয়।

৭। শিশ্ন- এ অঙ্গটি নলাকার পেশিবহুল এবং উত্থানশীল, এ অঙ্গের মধ্য দিয়ে মূত্রনালি বিস্তৃত থাকে।
কাজ- ক। এটি যৌন সঙ্গমে অংশ গ্রহণ করে, খ। এটি শুক্রাণু বিশিষ্ট বীর্যরস স্ত্রী জননতন্ত্রের ভেতর প্রেরণ করে।
৮। গ্রন্থিসমূহ-
(ক) প্রোস্টেট গ্রন্থি- এটি মূত্রথলির নিচে অবস্থিত নাশপাতি আকৃতির একটি গ্রন্থি। এর প্রাচীর আংশিকভাবে গ্রন্থিময় এবং আংশিকভাবে পেশি ও তন্তুময়।
কাজ- (i) এ গ্রন্থি থেকে একধরনের ক্ষারীয় তরল নিঃসৃত হয় যা সিমেন বা বীর্য তৈরিতে সহায়তা করে, (ii) এ তরল P^H নিয়ন্ত্রন ও শুক্রাণুর চলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
(খ) কাওপার গ্রন্থি- প্রোস্টেট গ্রন্থির নিচে মূত্রনালির দু'পাশে দুইটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতির গ্রন্থি বিদ্যমান। এদের কাওপার গ্রন্থি বলে। এরা দুটি খাটো নালির মাধ্যমে মূত্রনালির সাথে যুক্ত থাকে।
কাজ- সঙ্গমের সময় পিচ্ছিল মিউকাস পদার্থ ক্ষরণ করে।

চিত্র ৯.১.১ : পুংজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

পুরুষ সেক্স হরমোনের প্রভাব- শুক্রাশয় থেকে টেস্টোস্টেরন নামক গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ যৌন হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি শুক্রাণু জননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে এবং পুরুষের যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। শুক্রাশয়ের সারটোলি কোষ অল্প পরিমাণ ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণ করে যা শুক্রাণু তৈরিতে সহায়তা করে। এছাড়া সারটোলি কোষ নিঃসৃত ইনহিবিন হরমোন শুক্রাণু সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পুরুষ প্রজননতন্ত্রের অংশগুলোর নাম ও কাজ এর একটি ছক প্রস্তুত করুন

সারসংক্ষেপ

মানব পুংজননতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত- ১। শুক্রাশয় (Testis), ২। অণ্ডকোষ (Scrotum), ৩। এপিডিডাইমিস (Epididymis), ৪। শুক্রনালি বা ভাস ডিফারেন্স (Vas deferens), ৫। সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle), ৬। ক্ষেপণ নালি (Ejaculatory duct), ৭। মূত্রনালি (Urethra), ৮। শিশ্ন (Penis), ৯। গ্রন্থিসমূহ (Glands)। শুক্রাশয় থেকে টেস্টোস্টেরন নামক গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ যৌন হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি শুক্রাণু জননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে এবং পুরুষের যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। শুক্রাশয় থেকে নিম্নের কোন হরমোনটি নিঃসৃত হয়-
(ক) প্রোজেস্টেরন (খ) ইস্ট্রোজেন
(গ) টেস্টোস্টেরন (ঘ) থাইরক্সিন

২। শুক্রাণু উৎপন্নের অনুকূল তাপমাত্রা রক্ষা করে কোন অঙ্গ?
(ক) এপিডিডাইমিস (খ) স্ক্রোটাম
(গ) ভাস ডিফারেন্স (ঘ) সেমিনাল ভেসিকল

৩। নিম্নের কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ক্ষারীয় তরল সিমেন বা বীর্য তৈরিতে সহায়তা করে-
(ক) কাওপার (খ) প্রোস্ট্রেট
(গ) পিটুইটারি (ঘ) শুক্রাশয়

৪। সিমেন তৈরির জন্য পিচ্ছিল পদার্থ ক্ষরণ করে কোন অঙ্গ?
(ক) ভাস ডিফারেন্স (খ) শুক্রাশয়
(গ) সেমিনাল ভেসিকল (ঘ) এপিডিডাইমিস

পাঠ-৯.২ স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও হরমোনের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্ত্রী সেক্স হরমোনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	পেরিমেট্রিয়াম, সারভিক্স

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র : স্ত্রীদেহে যে তন্ত্রের সাহায্যে ডিম্বাণু উৎপাদন পুরুষ দেহ থেকে আগত শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুর নিষেক, জাইগোট ও ভ্রুণ বিকাশ সম্পন্ন হয় তাকে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র বলে। স্ত্রী প্রজননতন্ত্রে নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকে-

১। ডিম্বাশয় (Ovary): একজোড়া ডিম্বাশয় স্ত্রী জননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। এদের আকৃতি উপবৃত্তাকার, কিছুটা কাঠ বাদামের মত। প্রতিটি পরিণত ডিম্বাশয় এর দৈর্ঘ্য ২.৫ থেকে ৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১.৫-৩ সেন্টিমিটার, পুরু প্রায় ১ সেন্টিমিটার। প্রতিটি ডিম্বাশয় মেসোভেরিয়াম নামক পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত এবং পেলভিসের অভ্যন্তরে শক্ত দৃঢ় যোজক কলা দ্বারা আটকানো থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় কর্টেক্স ও মেডুলা নিয়ে গঠিত।

কাজ- এখানে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রী যৌন হরমোনসমূহ ক্ষরিত হয়।

২। ডিম্বনালি (Fallopian tube)- জরায়ুর দু'পাশে অবস্থিত দুটি পেশল ও প্রায় ১২ সে. মিটার লম্বা নালি। ডিম্বনালির এক প্রান্ত ডিম্বাশয়ের কাছে পেরিটোনিয়াম গহ্বর ও অন্য প্রান্ত জরায়ু গহ্বরে উন্মুক্ত। ডিম্বনালির যে প্রান্তটি পেরিটোনিয়াম গহ্বরে উন্মুক্ত, তা ফানেল আকৃতির এবং এ প্রান্ত থেকে কতগুলো অভিক্ষেপ বের হয়ে ঝালর বা ফিমব্রি (Fimbriae) গঠন করে।

কাজ- ক। ডিম্বনালি ডিম্বাশয় থেকে পরিপক্ক ডিম্বাণুকে গ্রহণ করে জরায়ুতে পৌঁছে দেয়, খ। রস ক্ষরণ করে নিষেকের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং গ। এখানে নিষেক সংঘটিত হয়।

৩। জরায়ু (Uterus/Womb)- জরায়ু একটা ফাঁপা, পুরু প্রাচীর যুক্ত এবং পেশিগঠিত থলিকাকার অংশ। শ্রোণি গহ্বরে মূত্রাশয় ও মলাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। জরায়ুর প্রাচীর ৩টি স্তরযুক্ত, বাইরের স্তরকে পেরিমেট্রিয়াম (Perimetrium), মাঝের স্তরকে মায়োমেট্রিয়াম (Myometrium) এবং অন্তঃস্তরকে এন্ডোমেট্রিয়াম (Endometrium) বলে। এন্ডোমেট্রিয়ামে জাইগোটের সংস্থাপন ঘটলে গর্ভধারণ হয়। জরায়ুর উপরের প্রশস্ত অংশকে জরায়ুদেহ (Body of uterus) এবং নিচের সংকীর্ণ ভাগকে জরায়ু গ্রীবা বা সারভিক্স (Cervix) বলে। জরায়ু দু'পাশে দুটি ডিম্বনালি এবং পিছনে যোনির সাথে সংযুক্ত থাকে। সারভিক্সের সরু পথে বীর্যরস জরায়ুতে প্রবেশ করে।

কাজ- ক। জরায়ুতে নিষিক্ত জাইগোট প্রতিস্থাপিত হয় এবং এখানেই ভ্রূণের বিকাশ ঘটে, খ। জরায়ুর প্রাচীর থেকে অমরা গঠিত হয়, গ। অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন হয়।

৪। যোনি (Vagina)- মূত্রনালির নিচ দিয়ে প্রসারিত ৮-১০ সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার খাদকে যোনি বলে। এর এক প্রান্ত জরায়ুতে এবং অন্য প্রান্ত দেহের বাইরে উন্মুক্ত থাকে। যোনির প্রাচীরে রুগী নামক অসংখ্য ভাঁজ থাকে। দুটি মাংসল ভাঁজ কপাটের মত যোনিপথে ঢেকে রাখে। এদের লেবিয়া মেজরা (Labia majora) ও লেবিয়া মাইনরা (Labia minora) বলে। লেবিয়া মেজরার উপরের দিকে একটি ছোট মাংসপিণ্ড থাকে। একে ক্লাইটোরিস বলে। এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

কাজ- ক। সঙ্গমের সময় যোনি শিশ্ন গ্রহণ করে, খ। বীর্য স্খলনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনা প্রদান করে এবং স্খলিত বীর্য গ্রহন করে, গ। এর প্রাচীর থেকে মিউকাসযুক্ত পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসৃত হয়ে সঙ্গমকে আনন্দময় করে এবং ঘ। সন্তান প্রসবের সময় এটি প্রসারিত হয়ে প্রসবকে সহজ করে।

চিত্র ৯.২.১ : স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ (ক) পার্শ্ব দৃশ্য, (খ) সম্মুখ দৃশ্য

স্ত্রী সেক্স হরমোনের প্রভাব- স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের ডিম্বাশয় থেকে প্রধানতঃ দু'ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়। যথা- ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) ও প্রোজেস্টেরন (Progesterone)। ইস্ট্রোজেন মেয়েদের যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং মাসিক বা ঋতুচক্র ও স্তনগ্রন্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোজেস্টেরন জরায়ুর প্রাচীরকে ভ্রূণ ধারণ উপযোগী করে এবং গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের সাথে জড়িত হরমোনগুলোর নাম ও কাজের একটি ছক প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

স্ত্রীদেহে যে তন্ত্রের সাহায্যে ডিম্বাণু উৎপাদন পুরুষ দেহ থেকে আগত শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুর নিষেক, জাইগোট ও ভ্রূণ বিকাশ সম্পন্ন হয় তাকে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র বলে। স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অংশগুলো হলো- ১। ডিম্বাশয়, ২। ডিম্বনালি, ৩। জরায়ু , ৪। যোনি। স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের ডিম্বাশয় থেকে প্রধানত দু'ধরণের হরমোন নিঃসৃত হয়। যথা- ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) ও প্রোজেস্টেরন (Progesterone)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। জরায়ুর নিচের সংকীর্ণ ভাগকে কি বলে?
(ক) ডিম্বনালি (খ) সারভিক্স
(গ) ইনফান্ডিবুলাম (ঘ) লিগামেন্ট

২। কোনটির মাধ্যমে ভ্রূণের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন করে?
(ক) অ্যামনিওন (খ) কর্পাস লুটিয়াম
(গ) অমরা (ঘ) জার্মলেয়ার

৩। নিষেক সম্পন্ন হয় কোথায়?
(ক) ডিম্বাশয় (খ) ডিম্বনালি
(গ) জরায়ু (ঘ) অমরা

পাঠ-৯.৩ প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্যামেটোজেনেসিসের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিষেক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানব ভ্রূণের পরিস্ফুটনের ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	বয়ঃসন্ধিকাল, রজঃচক্র, গ্যামেটোজেনেসিস, উওজেনেসিস, অর্গানোজেনেসিস

পুরুষ ও নারী প্রজননক্ষম হওয়ার লক্ষণসমূহ অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছানো, পুরুষের জননঅঙ্গ পুংগ্যামিট সৃষ্টি, নারীর জনন অঙ্গ স্ত্রী গ্যামিট সৃষ্টি, রজঃচক্র, নিষেক ইত্যাদি প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় বা দশা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা

১। বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty/Adolescense): মানবজীবনের যে পর্যায়ে পুরুষ ও স্ত্রী দেহে বাহ্যিক গৌন যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ বিকশিত হতে থাকে এবং প্রজনন অঙ্গগুলো সক্রিয় হতে শুরু করে তাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়টি হচ্ছে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণের মুহূর্ত। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের বয়স ১৩-১৪ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১-১৪ বছর বলে বিবেচনা করা হয়। এ সময় বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে দৈহিক গঠন ও চরিত্রে নানা পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বয়ঃসন্ধিকালের এসব বৈশিষ্ট্যকেই গৌন যৌন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন- মেয়েদের স্তন, ছেলেদের দাঁড়ি-গোঁফ ইত্যাদি।

গৌন যৌন বৈশিষ্ট্য

ছেলে	মেয়ে
মুখ, বগল ও শ্রোণিদেশে লোম গজানো শুরু হয়	বগল ও শ্রোণিদেশে লোম গজানো শুরু হয়
লিঙ্গ ও শুক্রাশয় আকারে বৃদ্ধি পায়	স্তন ও জরায়ু বৃদ্ধি পায়
স্বরযন্ত্রের বৃদ্ধি ও কণ্ঠস্বর গাঢ় বা গম্ভীর হয়	পাছা/নিতম্ব (Hips) প্রশস্ত হয়
শুক্রাণু উৎপাদন ও বীর্যপাত শুরু হয়	রজঃচক্র/মাসিক ও ডিম্বস্ফুটন শুরু হয়

২। **রজঃচক্র (Menstrual cycle)-**

(ক) রজঃস্রাবীয় পর্যায় (১-৫ দিন) - রজঃস্রাব এ পর্যায়ের প্রারম্ভ নির্দেশ করে। ডিম্বপাতের পর ডিম্বাণু নিষিক্ত না হলে (৩৬ ঘণ্টার মধ্যে) কর্পাস লুটিয়াম নষ্ট হয়ে যায়। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন-এর ক্ষরণমাত্রা কমে যাওয়ায় এন্ডোমেট্রিয়াম আর বৃদ্ধি পায় না এবং ভাঙ্গতে শুরু করে। রক্তের অভাবে এন্ডোমেট্রিয়ামের কুণ্ডলীকৃত ধমনিগুলো প্রসারিত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন এর ক্ষরণমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেলে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির উপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায় তখন Follicle Stimulating Hormone ও Leutinizing Hormone ক্ষরণ শুরু হয়। ফলে এন্ডোমেট্রিয়াম ভেঙ্গে গিয়ে অনিষিক্ত ডিম্বাণুসহ মিউকাস ও রক্ত যোনি পথে নির্গত হয়। শুরু হয় রজঃচক্র পর্যায়।

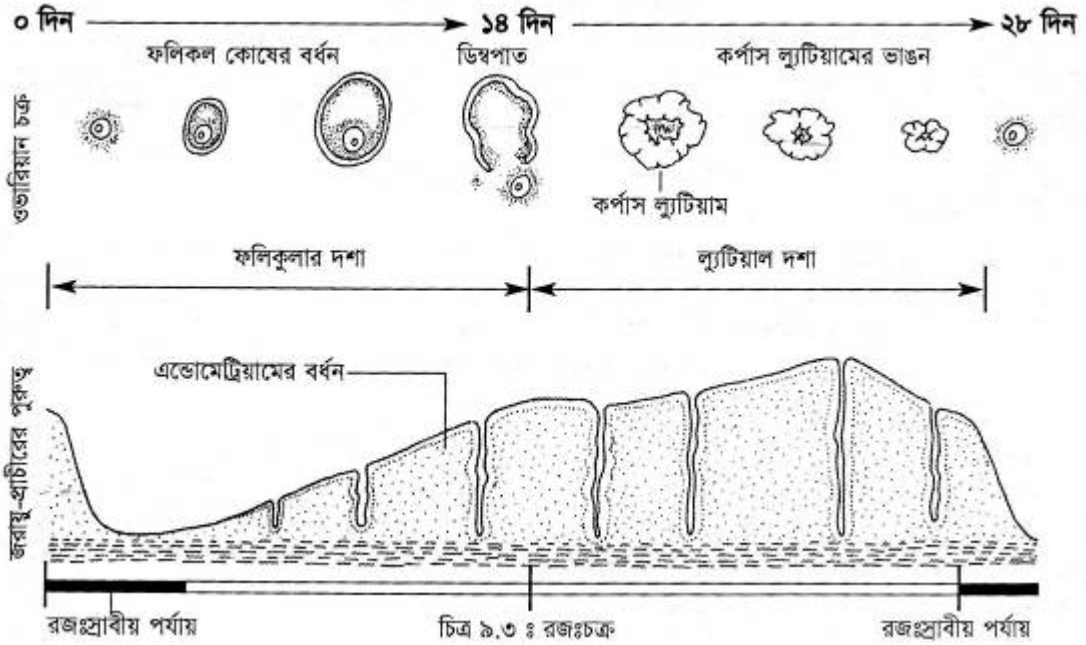

চিত্র ৯.৩ ঃ রজঃচক্র

চিত্র ৯.৩.১ : রজঃচক্র

(খ) ফলিকল পর্যায় (৬-১৩ দিন)- রজঃচক্রের ৬-১৩তম দিনে বর্ধনশীল ফলিকলের ফলিকল কোষ থেকে অধিক মাত্রায় ইস্ট্রোজেন ক্ষরিত হয়। জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম পুরু হতে শুরু করে, গ্রন্থিসমূহ কুণ্ডলীত হতে থাকে ও রক্ত জালিকাগুলো বৃদ্ধি পায়।

(গ) ওভ্যুলেশন পর্যায় (১৪ দিন)- লুটিনাইজিং হরমোনের প্রভাবে চতুর্দশ দিনে গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণু মুক্ত হয়ে ডিম্বনালির মাধ্যমে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণুর নিঃসরণ বা নিষ্ক্রমণকে ডিম্বস্ফুটন (Ovulation) বলে।

(ঘ) কর্পাস লুটিয়াম পর্যায় (১৫-২৮ দিন)- ডিম্বাণু নিষ্ক্রমণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফলিকলের অবশিষ্ট থিকা কোষগুলোতে দ্রুত ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যাকে লুটিনাইজেশন বলে। ফলে গ্রাফিয়ান ফলিকল কর্পাস লুটিয়াম (corpus luteum) এ পরিণত হয়। হলুদ বর্ণ ধারণ করে বলে কর্পাস লুটিয়ামকে ইয়েলো বডি (yellow body)ও বলা হয়। কর্পাস লুটিয়াম ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন তৈরি করে। ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য প্রোজেস্টেরন জরায়ু প্রাচীরকে উপযোগী করে এবং একই সাথে ফলিকল উদ্দীপক হরমোন উৎপাদনে বাঁধা দেয়। ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে ভ্রূণ জরায়ু প্রাচীরে প্রথিত হয়। পরবর্তীতে সৃষ্ট প্লাসেন্টা ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন তৈরির মাধ্যমে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশের পরিবেশ বজায় রাখে। ডিম্বাণু নিষিক্ত না হলে ১০-১২ দিন পর কর্পাস লুটিয়াম নষ্ট হয়ে যায় ফলে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপাদন বন্ধ হয়। ফলশ্রুতিতে রক্ত জালক ফেটে গিয়ে পরবর্তী চক্রের রজঃস্রাব পর্যায় শুরু হয়।

গ্যামিটোজেনেসিস বা গ্যামিট সৃষ্টি (Gametogenesis) : যৌন জননক্ষম মানুষের জননকোষ বা গ্যামিট সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়াকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। গ্রিক gamos-জননকোষ এবং genesis-উৎপত্তি হওয়া এর সমন্বয়ে gametogenesis শব্দটি গঠিত। যৌন জননক্ষম পরিণত পুরুষের শুক্রাশয় এবং স্ত্রীর ডিম্বাশয়ের জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ থেকে গ্যামেটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। গ্যামেটোজেনেসিস দু'প্রকার, যথা- (ক) স্পার্মাটোজেনেসিস ও (খ) উওজেনেসিস।

(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis: sperma = শুক্রাণু + genesis = জনন)- যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননক্ষম পুরুষের শুক্রাশয় থেকে স্পার্ম বা শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস বা শুক্রাণুজনন প্রক্রিয়া বলে। পুরুষের প্রতিটি শুক্রাশয় অসংখ্য সেমিনিফেরাস নালিকা নিয়ে গঠিত। এসব নালিকার অন্তঃপ্রাচীর জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা আবৃত

থাকে। এসব জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ থেকেই শুক্রাণু সৃষ্টি করে। জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষের ফাঁকে ফাঁকে সার্টলি কোষ (sertoly cell) থাকে। এরা বর্ধনশীল শুক্রাণুতে পুষ্টি সরবরাহ করে।

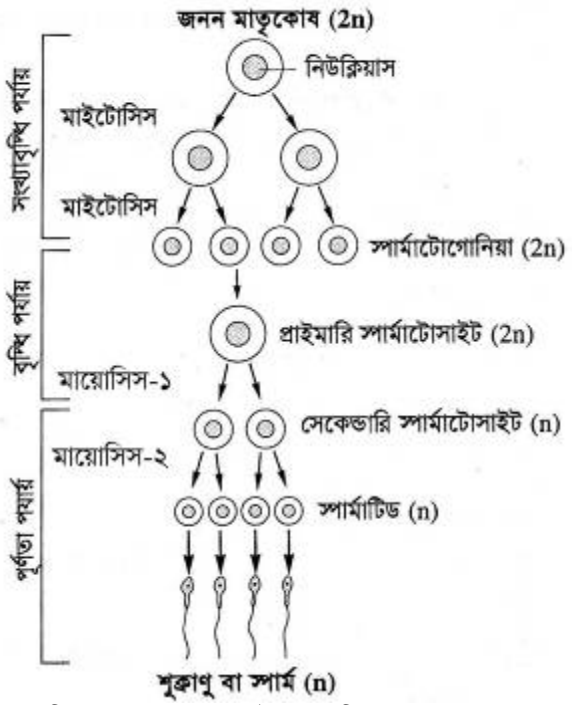

চিত্র ৯.৩.২ : গ্যামেটোজেনেসিস এর ধাপসমূহ

শুক্রাণুজনন একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত চারটি ধাপে বর্ণনা করা যায়-

i. সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase): জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের যেসব কোষ থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাদের প্রাইমারি জার্মিনাল কোষ বা প্রিমোর্ডিয়াল কোষ বলে। এগুলো মাইটোসিস পদ্ধতিতে পুনঃপুনঃ বিভাজিত হয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। এসব কোষকে স্পার্মাটোগোনিয়া বলে। এগুলো ডিপ্লয়েড (২n) ধরনের কোষ।

ii. বৃদ্ধি পর্যায় (Growth phase): প্রতিটি স্পার্মাটোগোনিয়াম সেমিনিফেরাস নালিকার সার্টলি কোষ (sertoli cell) থেকে খাদ্য শোষণ করে আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষগুলোকে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (২n) বলে।

iii. পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Maturation phase): এ পর্যায়ের প্রথমে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটগুলোতে প্রথম মায়োসিস বিভাজন ঘটে। এর ফলে সৃষ্ট কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়। এদের সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট বলে।

এদের প্রতিটি দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি করে স্পার্মাটিড (spermatid) গঠন করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (২n) থেকে চারটি হ্যাপয়েড স্পার্মাটিড (n) গঠিত হয়।

iv. স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis): যে প্রক্রিয়ায় স্পার্মাটিডগুলো রূপান্তরিত হয়ে স্পার্ম বা শুক্রাণু গঠন করে তাকে স্পার্মিওজেনেসিস বলে। এসময় নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়-

- নিশ্চল, গোলাকার ও বিপুল সাইটোপ্লজমযুক্ত স্পার্মাটিড পরিবর্তিত হয়ে সচল, লম্বাকৃতির ও প্রায় সাইটোপ্লাজমবিহীন শুক্রাণু গঠন করে।
- স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসটি পানি, RNA ও নিউক্লিয়োলাস পরিত্যাগ করে সংকুচিত হয় এবং শুক্রাণুর মাথা গঠন করে।
- স্পার্মাটিডের গলগি বস্তু থেকে অ্যাক্রোসোম সৃষ্টি হয়ে শুক্রাণুর মাথায় টুপির মত অবস্থান করে।
- স্পার্মাটিডের মাইটোকণ্ড্রিয়া সর্পিলভাবে পেঁচিয়ে শুক্রাণুর মধ্যাংশ গঠন করে।
- স্পার্মাটিডের সেন্ট্রিয়োল শুক্রাণুর অক্ষীয় সূত্রক ও লেজ গঠন করে।

- শুক্রাণুজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে।

শুক্রাণুর গঠন

বিভিন্ন প্রাণীতে শুক্রাণুর আকৃতি বিভিন্ন হয়। প্রধানতঃ এরা সরু, দীর্ঘাকার এবং লম্বা লেজ যুক্ত। অধিকাংশ প্রাণীর শুক্রাণু ক্ষুদ্র ও আণুবীক্ষণিক। মানুষের শুক্রাণুর ব্যাস ২.৫ মাইক্রন এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০-৭০ মাইক্রন। শুক্রাণুর দেহ প্রধানতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত।

চিত্র ৯.৩.৩ : শুক্রাণুর গঠন

i. মস্তক (Head)- শুক্রাণুর সম্মুখ ভাগের উপবৃত্তাকার অংশকে মাথা বা মস্তক বলে। মস্তকে তুলনামূলক ভাবে বড় একটি নিউক্লিয়াস থাকে এবং নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মস্তকের অগ্রপ্রান্তে টুপির ন্যায় থলি বিশেষ অ্যাক্রোসোম নামক একটি গঠন থাকে। অ্যাক্রোসোম উপস্থিত টিস্যু গলনকারী এনজাইমসমূহ ডিম্বাণুর ঝিল্লী ভেদ করে ভেতরে প্রবেশে সাহায্য করে।

ii. গ্রীবা (Neck)- শুক্রাণুর মাথার পিছনে খাটো, সরু অংশকে গ্রীবা বলে। এখানে পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি সেন্ট্রিয়োল (প্রক্সিমাল সেন্ট্রিয়োল ও ডিস্টাল সেন্ট্রিয়োল) থাকে। অগ্র বা প্রক্সিমাল সেন্ট্রিয়োল (proximal centriole) নিউক্লিয়াসের সাথে ডিম্বাণুতে গমন করে এবং নিষেক পরবর্তী মাইটোসিস স্পিন্ডল (mitosis spindle) গঠনে সাহায্য করে। পশ্চাৎ বা ডিস্টাল সেন্ট্রিয়োল থেকে অক্ষীয় তন্তু (axial filament) সৃষ্টি হয়ে লেজের পশ্চাৎ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

iii. লেজ (Tail)- গ্রীবার পিছনে অবস্থিত শুক্রাণুর সবচেয়ে লম্বা অংশটি লেজ নামে পরিচিত। লেজের প্রথম অংশটিকে মধ্যম অংশ (middle piece) বলে। মধ্যম অংশে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া অক্ষীয় তন্তুকে সর্পিলাকারে ঘিরে থাকে। লেজের শেষ প্রান্তের কিছু অংশে প্লাজমা পর্দা থাকে না। লেজে একজোড়া মাইক্রোটিউব্যুলকে ঘিরে নয় জোড়া মাইক্রোটিউব্যুল (microtubule) থাকে। লেজ শুক্রাণুর চলনে সহায়তা করে।

(খ) উওজেনেসিস (Oogenesis: গ্রিক Oon = ডিম্বাণু এবং genesis = সৃষ্টি) : যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননক্ষম মহিলার ডিম্বাশয় থেকে ডিম বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তাকে উওজেনেসিস বা ডিম্বাণু জনন প্রক্রিয়া বলে। মহিলাদের ডিম্বাশয়ের প্রাচীরের প্রাইমারি জার্মিনাল কোষ থেকে উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।

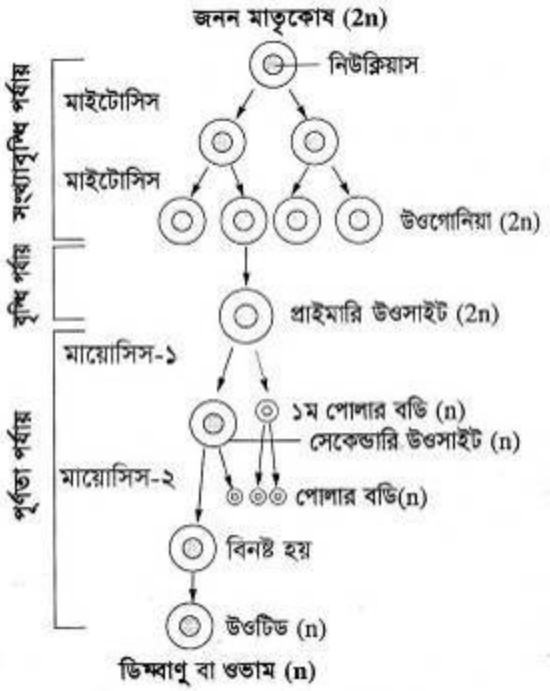

চিত্র ৯.৩.৪ : উওজেনেসিস

এ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত চারটি ধাপে সংঘটিত হয়-

i. সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase): এ পর্যায়ে ডিম্বাশয়ের প্রাচীরের কিছু জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ (২n) বার বার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। এভাবে উৎপন্ন কোষগুলোকে উওগোনিয়া (oogonia) বলে। এরা ডিপ্লয়েড (২n) প্রকৃতির।

ii. বৃদ্ধি পর্যায় (Growth phase): এ পর্যায়ে ডিম্বাশয়ের প্রাচীরে অবস্থিত উওগোনিয়াগুলো পুষ্টিলাভ করে আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে নিউক্লিয়াসে মায়োসিস বিভাজনের প্রথম প্রোফেজ দশা শুরু হয়। এ পর্যায়ের ডিম্বকোষকে প্রাইমারি উওসাইট বলে। এতেও ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। প্রতিটি প্রাইমারি উওসাইট (২n) একস্তর গ্রানুলোসা বা ফলিকল কোষ (granulose follicle) দ্বারা আবৃত হয়ে প্রাইমারি ফলিকল (primary follicle) এ পরিণত হয়।

iii. পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Growth phase): বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রাইমারি ফলিকল বৃদ্ধি লাভ করে। এদের মধ্যে সাধারণত একটি পরিপক্ক হয় এবং অবশিষ্টগুলো বিলুপ্ত হয়। পরিপক্ক প্রাইমারি ফলিকলকে গ্রাফিয়ান ফলিকল বলে। বৃদ্ধিরত প্রাইমারি ফলিকলের অভ্যন্তরস্থ প্রাইমারি উওসাইট প্রথম মায়োসিস বিভাজন দ্বারা দুটি অসম কোষ উৎপন্ন করে। বড় কোষটিকে সেকেন্ডারি উওসাইট (secondary oocyte) এবং ছোট কোষটিকে ১ম পোলার বডি (first polar body) বলে। ১ম পোলার বডি অতঃপর মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে দুটি পোলার বডি তৈরি করে। অপরদিকে, সেকেন্ডারি উওসাইট নিষেকের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। বিভিন্ন স্তন্যপায়ী ও মানুষের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি উওসাইট অবস্থায় ডিম্বাণু নির্গমন বা ওভ্যুলেশন (ovulation) হয়। পরে যখন কোন শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা ভেদ করে, তখন সেকেন্ডারি উওসাইটে দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজন মাইটোসিস পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ হয়। ফলে পরিণত ডিম্বাণু (mature ovum) উৎপন্ন হয় এবং দ্বিতীয় পোলার বডি তৈরি হয়। নিষিক্ত না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডিম্বাণু বিনষ্ট হয়।

iv. রূপান্তর পর্যায় (Growth phase): এ পর্যায়ে উওটিড রূপান্তরিত হয়ে ওভাম (ovum) বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। তবে শুক্রাণুর মত এক্ষেত্রে আকৃতি ও আকারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে না। কেবল নিষেকের প্রস্তুতি লাভের জন্য এর ভেতরের বস্তুসমূহের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। পোলার বডিসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়।

মানুষের ডিম্বাণুর গঠন : স্ত্রী জননকোষের নাম ডিম্বাণু। এটি মোটামুটি গোলাকার এবং ১২০-১৫০ মাইক্রন ব্যাসবিশিষ্ট। ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলের উওসাইট (oocyte) বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পরিপক্ক ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। প্রতিটি পরিপক্ক ডিম্বাণুকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) ডিম্বাণু ঝিল্লী, (খ) নিউক্লিয়াস ও (গ) সাইটোপ্লাজম।

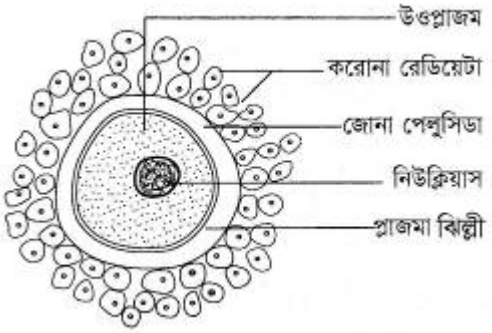

চিত্র ৯.৩.৫ : ডিম্বাণুর গঠন

i. ডিম্বাণু ঝিল্লি (Egg membrane): লিপোপ্রোটিন সমৃদ্ধ প্লাজমা মেমব্রেন দ্বারা ডিম্বাণু আবৃত থাকে। প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে জোনা পেলুসিডা (zona pellucida) নামক একটি প্রাইমারি আবরণ বিদ্যমান। প্রাইমারি আবরণীর বাইরে আবার করোনা রেডিয়েটা (corona radiata) নামক একটি সেকেন্ডারি আবরণ থাকে।
ii. সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm): ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম উওপ্লাজম (ooplasm) নামে পরিচিত। এতে প্রচুর গলগি বডি, মাইটোকণ্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও কর্টিক্যাল গ্রানিউল (Cortical granule) থাকে। মানুষের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ অতি সামান্য। কুসুম সাইটোপ্লাজমে সমানভাবে ছড়ানো থাকে। তাই মানুষের ডিম্বাণুকে মাইক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু (microlecithal egg) বলে।
iii. নিউক্লিয়াস (Nucleus): ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস বেশ বড়, তবে কেন্দ্র থেকে একটু সরে অবস্থান করে। নিষেকের সময় নিউক্লিয়াসটি কেন্দ্রে আসে। এতে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক (n) ক্রোমোসোম থাকে।

নিষেক : যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে এদের হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমসোমবাহী নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটিয়ে ডিপ্লয়েড (২n) ক্রোমসোমবিশিষ্ট জাইগোট গঠন করে তাকে নিষেক বলে। নিষেক একটি বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়া। নিষেক ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে। নিষেক প্রজাতি নির্দিষ্ট (species specific) অর্থাৎ কেবল একই প্রজাতির ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্যে নিষেক ঘটে। ডিম্বাণু শুক্রাণু দ্বারা একবারই নিষিক্ত হয়।

চিত্র ৯.৩.৬ : নিষেক প্রক্রিয়া

মানুষের নিষেক স্ত্রীর ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান নালিতে সংঘটিত হয়। যৌন মিলনের সময় বীর্যের (semen) সাথে অসংখ্য শুক্রাণু জরায়ুতে প্রবেশ করে কিন্তু কেবল একটি শুক্রাণু নিষেক ক্রিয়ায় সফল হয়। প্রতিবার সঙ্গমে ১.৫-৪ মিলিলিটার বীর্য ক্ষরিত হয় এবং এতে প্রায় ৪০-১০০ মিলিয়ন (৪-১০ কোটি) শুক্রাণু থাকে। যৌন মিলনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষেক সংঘটিত না হলে শুক্রাণু মারা যায়। নিষেক নিম্নলিখিত উপায়ে সংঘটিত হয়-
ক. নিষেকযোগ্য ডিম্বাণুটি প্রকৃতপক্ষে একটি সেকন্ডারি উওসাইট। এটি করোনা রেডিয়েটা (coronal radiata) নামক কয়েক

স্তর ফলিকল কোষ এবং জোনা পেলুসিডা (zona pellucida) আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।
খ. একটি শুক্রাণু সেকেন্ডারি উওসাইটের কাছাকাছি পৌঁছালে শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোম পর্দা ফেটে গিয়ে হায়ালুরোনিডেজ (hyaluronidase) ও প্রোটিয়েজ এনজাইম মুক্ত হয়।
গ. এনজাইমদ্বয় উওসাইটের আবরণী পর্দাকে হজমের মাধ্যমে রাস্তা তৈরি করে। ফলে শুক্রাণু আবরণী ভেদ করে উওসাইটের প্লাজমামেমব্রেন পর্যন্ত প্রবেশ করে।
ঘ. অতঃপর শুক্রাণুর মাথা প্লাজমামেমব্রেন ভেদ করে উওসাইটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং লেজ বাইরে পরিত্যক্ত হয়।
ঙ. উওসাইটের অভ্যন্তরে শুক্রাণুর মাথা প্রবেশের সাথে সাথে দ্রুত একটি বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এ বিক্রিয়ায় উওসাইটের কর্টিকাল দানার সাথে জোনা পেলুসিডা মিলে উওসাইটের চারিদিকে নিষেক পর্দা সৃষ্টি করে। এতে দ্বিতীয় কোন শুক্রাণু উওসাইটে প্রবেশ করতে পারে না।
চ. শুক্রাণুর প্রবেশ সেকেন্ডারি উওসাইটের নিউক্লিয়াসে দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন ঘটায়। ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু ও একটি দ্বিতীয় পোলার বডি তৈরি হয়। এ অবস্থায় ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসকে প্রোনিউক্লিয়াস বলে।
ছ. প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয় অতঃপর কাছাকাছি আসে, মিলিত হয় এবং ডিপ্লয়েড জাইগোট (২n) গঠন করে।

৫। গর্ভধারণ/ইমপ্লান্টেশন : ডিম্বাণু নিষেকের পরপরই জাইগোটে কোষ বিভাজন শুরু হয়। কোষ বিভাজনকে ক্লিভেজ (cleavage) বলে। ক্লিভেজের ফলে প্রথম মরুলা (morula), অতঃপর ব্লাস্টুলা (blastula) সৃষ্টি হয়। ব্লাস্টুলা গঠনকারী কোষকে ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere), ভেতরের গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল (blastocoel), বাইরের আবরণ সৃষ্টিকারী ব্লাস্টোমিয়ারকে ট্রোফোব্লাস্ট (trophoblast) এবং ভেতরের সমবেত কোষ গুচ্ছকে অন্তঃস্থ কোষগুচ্ছ (inner cell mass) বলে। এ অবস্থায় গঠনটি ব্লাস্টোসিস্ট (blastocyst) নামে পরিচিত।

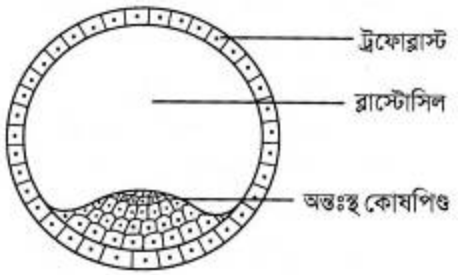

চিত্র ৯.৩.৭ : একটি ব্লাস্টোসিস্টের বিভিন্ন অংশ

ফেলোপিয়ান নালি অতিক্রমকালে ব্লাস্টোসিস্ট গঠিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুতে পৌছার পর জোনা পেলুসিডা অবলুপ্ত হয় এবং নিষেকের ৬-৯ দিনের মধ্যে ব্লাস্টোসিস্টটি এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত বা রোপিত হওয়ার পদ্ধতিকে ইমপ্লান্টেশন বলে। গর্ভধারণের পর ট্রফোব্লাস্ট দুটি স্তরে বিভক্ত হয়। বাইরের স্তরকে কোরিওন (chorion) বলে। কোরিওন থেকে এন্ডোমেট্রিয়ামের অভ্যন্তর ভাগে আঙ্গুলের ন্যায় অভিক্ষেপ সৃষ্টি হয়। অভিক্ষেপগুলোকে কোরিওনিক ভিলাই (choronic villi) বলে। কোরিওনিক ভিলাই এর মাধ্যমেই জরায়ু ও ট্রোফোব্লাস্টের মধ্যে পুষ্টি, অক্সিজেন ও বর্জ্য পদার্থের আদান প্রদান ঘটে। পরবর্তীতে প্লাসেন্টা দ্বারা এ কাজটি সম্পাদিত হয়।

৬। মানব ভ্রূণের পরিস্ফুটন : নিষেকের পর জাইগোট (Zygote) যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশু বা লার্ভায় পরিণত হয় তাকে পরিস্ফুটন বলে। প্রতিটি সদস্যের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন বলা হয়। যে শাখায় জীবের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয়, তাকে ভ্রূণবিদ্যা বলে। জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে এমব্রায়োজেনেসিস বলা হয়।

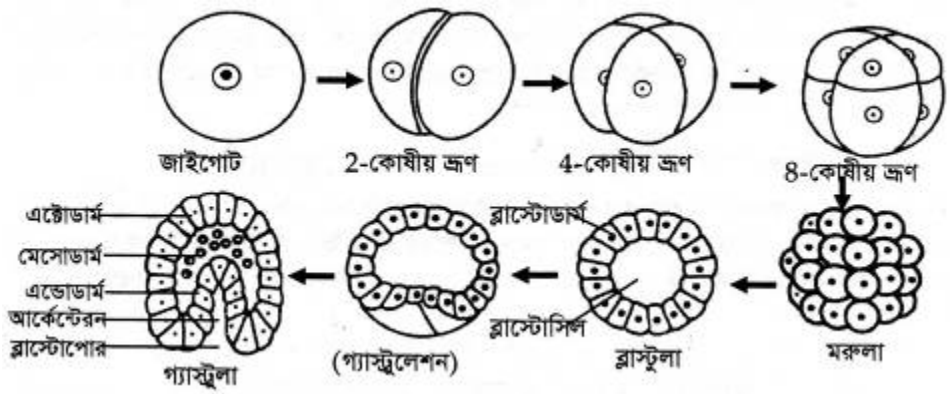

চিত্র ৯.৩.৮ : মানব ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের বিভিন্ন পর্যায়

ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের ধাপগুলো নিম্নরূপ-

ক। ক্লিভেজ (Cleavage): যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ভ্রূণকোষ তৈরি করে তাকে ক্লিভেজ বলে। ক্লিভেজে সৃষ্ট ভ্রূণের প্রতিটি কোষকে ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere) বলে। ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত কোষ বিভাজনের ফলে জাইগোটটি বহুকোষী নিরেট গোলকে পরিণত হয়। এর নাম মরুলা (morula)। মরুলার কোষগুলো ক্রমশ : এক স্তরে সজ্জিত হয় এবং এর ভেতরে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের এ দশাকে ব্লাস্টুলা বলে। ব্লাস্টুলার প্রাচীরকে ব্লাস্টোডার্ম এবং তরলপূর্ণ গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল বলে। ভ্রূণ ব্লাস্টুলায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্লিভেজ দশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

খ। গ্যাস্ট্রুলেশন : ব্লাস্টুলা বিকশিত হয়ে ভ্রূণের পরবর্তী পর্যায় গ্যাস্ট্রুলা গঠন করে। যে প্রক্রিয়ার ব্লাস্টুলা থেকে গ্যাস্ট্রুলা গঠিত হয় তাকে গ্যাস্ট্রুলেশন বলে। গ্যাস্ট্রুলেশন হল প্রাণীর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের একটি অতি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল দশা যাতে ব্লাস্টুলার একস্তরে সজ্জিত কোষগুলো দুস্তরে সজ্জিত হয়। বাইরের স্তরটি এক্টোডার্ম এবং ভেতরেরটি এন্ডোডার্ম নামে পরিচিত। পরবর্তীতে মোসোডার্ম নামের আরেকটি স্তর গঠিত হয়। ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা দশায় বিদ্যমান এসব স্তরকে ভ্রূণীয় স্তর বা জার্ম লেয়ার বলে। গ্যাস্ট্রলার ভেতরের গহবরকে আর্কেন্টেরন বলে। এটি একটি ছিদ্র দ্বারা বাইরে উন্মুক্ত হয়। এ ছিদ্রকে ব্লাস্টোপোর বলে। গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় ব্লাস্টুলার কোষসমূহ বা ব্লাস্টোমিয়ারের বিচলনের মাধ্যমে গ্যাস্ট্রুলা গঠিত হয় এবং প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ তথা সামগ্রিক গঠনের রূপরেখা তৈরি হয়।

গ। **অর্গানোজেনেসিস :** গ্যাস্ট্রুলেশনে সৃষ্ট বিভিন্ন ভ্রূণীয়স্তর থেকে বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র গঠন করার প্রক্রিয়াকে অর্গানোজেনেসিস বলে। প্রথমে ভ্রূণীয় স্তর থেকে ছোট ছোট কোষগুচ্ছ আলাদা হয়ে প্রাথমিক অঙ্গকুঁড়ি সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে অঙ্গকুঁড়ি আরও বিকশিত হয়ে প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে।

ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ : জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়ার পর থেকে গর্ভকালীন ৮ম সপ্তাহের শিশুকে ভ্রূণ এবং এর পর থেকে ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে ফিটাস (fetus) বলে। মায়ের জরায়ুর ভেতরে ভ্রূণ ও ফিটাস বিকশিত হয়। মাতৃগর্ভে শিশু প্রায় ৯ মাস বা ৩৬-৩৮ সপ্তাহ থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়।

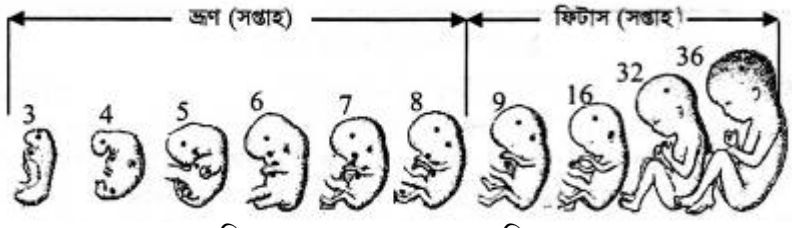

চিত্র ৯.৩.৯ : মানব ভ্রূণের বিকাশ

এ সময় যেসব পরিবর্তন ঘটে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-

প্রথম মাস	নিষিক্ত ডিম্বাণু বিভাজিত হয়ে প্রথমে ভ্রুণীয় স্তর এবং পরবর্তীতে প্রাথমিক অঙ্গকুঁড়ি গঠন করে। এসময় ভ্রূণের চারদিকে বিভিন্ন বহিঃভ্রুণীয় ঝিল্লী (কুসুম থলি, অ্যামনিওন, অ্যালানটয়েজ ও কোরিয়ন) সৃষ্টি হয়। শেষের দিকে অমরা, নাভী রজ্জু, নিউরাল নালি ও দেহখণ্ড বিকাশিত হয়। এসময় ভ্রুণ ১/৪ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। অমরার মাধ্যমে শিশু মাতৃদেহ হতে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং নিজ দেহ থেকে বর্জ্য অপসারণ করে।
দ্বিতীয় মাস	মাথার পাশে চামড়া ভাজ খেয়ে কানের সৃষ্টি করে। নিউরাল নালি অধিক বিকশিত হয়। হাত ও পা কুঁড়ির মতো বিকশিত হয়। ভ্রুণ একটি লেজ ও গলায় ফুলকা রন্ধ্র দেখা যায়। এসময় ১ ইঞ্চি লম্বা ও ১/৩০ আউন্স ওজনবিশিষ্ট হয়। দ্বিতীয় মাসের শেষের দিকের ভ্রুণকে ফিটাস বলে।
তৃতীয় মাস	ফিটাসের হাত ও পায়ের আঙ্গুল পূর্ণ বিকশিত হয় । প্রজনন অঙ্গ গঠিত হয় । তৃতীয় মাসের শেষের দিকে শিশু ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১ আউন্স ওজনবিশিষ্ট হয়।

চতুর্থ মাস	শিশুর চোখের পাতা ও ভ্রুণ, নখ ও চুল বিকশিত হয়। স্নায়ুতন্ত্র কাজ শুরু করে। হাত ও পায়ের সঞ্চালন শুরু হয়। বৃদ্ধাঙ্গুল চুষতে পারে। এসময় শিশু ৬ ইঞ্চি ও ৪ আউন্স ওজন বিশিষ্ট হয়।
পঞ্চম মাস	শিশুর মাথায় চুল গজায়। শিশুর ত্বক লানুগো (lanugo) নামক পাতলা ও নরম চুল দ্বারা আবৃত থাকে। পঞ্চম মাসের শেষের দিকে শিশু ১০ ইঞ্চি লম্বা ও ১/২ থেকে ১ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট হয়।
ষষ্ঠ মাস	শিশুর ত্বক লালচে বর্ণ ধারণ করে, কুঁচকানো এবং ত্বকে শিরা দৃষ্টিগোচর হয়। ফিঙ্গার প্রিন্ট দেখা যায়। চোখের পাতা খুলতে শুরু করে। এসময় শিশু ১২ ইঞ্চি লম্বা ও ২ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট হয়।
সপ্তম মাস	শিশুর দেহে চর্বি সঞ্চিত থাকে। শ্রবণ অঙ্গ পূর্ণ বিকশিত হয়। এসময় শিশু প্রায়শই অবস্থান পরিবর্তন করে এবং শব্দ, ব্যথা ও আলোর প্রতি সাড়া দেয়। শিশু ১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২-৪ পাউন্ড ওজনবিশিষ্ট হয়।
অষ্টম মাস	এসময় শিশুর দেহ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং শিশু দেখতে শুনতে পারে। ফুসফুস ব্যতীত দেহের সকল অন্তঃঅঙ্গ বিকশিত হয়। এসময় শিশু ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৫ পাউন্ড ওজনবিশিষ্ট হয়।
নবম মাস	ফুসফুস পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এসময় প্রতিবর্তি ক্রিয়াসমূহের সমন্বয় ঘটে ফলে শিশু চোখ মিট মিট করা, মাথা ঘুরানো, আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করা এবং শব্দ, আলো ও স্পর্শের প্রতি সাড়া দেয়া ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়। এসময় শিশু আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রায় ২০ ইঞ্চি লম্বা ও ৭ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট হয় এবং পৃথিবীতে আসার উপযোগী হয়।

৮। ভ্রুণীয় স্তরের পরিণতি (Fate of germ layers) : কর্ডাটা পর্বের সকল প্রাণীতে ভ্রূণীয়স্তরের পরিণতি মূলতঃ একই ধরনের হলেও বিভিন্ন শ্রেণিতে এর কিছু তারতম্য ঘটে। নিচে মানুষের তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতির তালিকা দেয়া হলো-

ভ্রুণীয় স্তর	পরিণত মানুষে গঠিত কলা
এক্টোডার্ম	ত্বক ত্বকোদ্ভূত অঙ্গাদির (ঘর্ম গ্রন্থি, তেল গ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, চুল, নখ) এপিডার্মিস। নাক, মুখ ও পায়ুর অন্তঃআবরণ বা এপিথেলিয়াল আবরণ, চোখের কর্নিয়া, লেন্স এবং অন্তঃকর্ণের মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ। স্নায়ুতন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গসমূহ, দাঁতের এনামেল।
মেসোডার্ম	ত্বকের ডার্মিস, নটোকর্ড, মেরুদণ্ড, কঙ্কালতন্ত্র, পেশি কলা ও যোজক কলা। বৃক্কের কর্টেক্স, পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশিকলা। দাঁতের ডেন্টিন ও চোখের বিভিন্ন অংশ। রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা। দেহ গহ্বরের অন্তঃপ্রাচীর।
এন্ডোডার্ম	পরিপাকনালির অন্তঃআবরণ বা এপিথেলিয়াল আবরণ। শ্বসনতন্ত্র, রেচননালি, মূত্রনালি ও মূত্রথলির এপিথেলিয়াল আবরণ। থাইমাস, থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি। গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি , অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**রজঃচক্রের পর্যায়সমূহ ছকাকারে ক্লাসে উপস্থাপন করুন'**

সারসংক্ষেপ

প্রজননের দশা হলো– ১। বয়ঃসন্ধিকাল, ২। রজঃচক্র। রজঃচক্রের পর্যায়গুলো– (ক) রজঃস্রাবীয় পর্যায় (১-৫ দিন), (খ) ফলিকল পর্যায় (৬-১৩ দিন), (গ) ওভ্যুলেশন পর্যায় (১৪ দিন), (ঘ) কর্পাস লুটিয়াম পর্যায় (১৫-২৮ দিন)। ৩। গ্যামেটোজেনেসিস বা গ্যামিট সৃষ্টি- যৌন জননক্ষম মানুষের জননকোষ বা গ্যামিট সৃষ্টি হওয়ায় প্রক্রিয়াকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। গ্যামেটোজেনেসিস দু'প্রকার, যথা- (ক) স্পার্মাটোজেনেসিস ও (খ) উওজেনেসিস। এ স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে চারটি ধাপে বর্ণনা করা যায়- সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়, বৃদ্ধি পর্যায়, পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়, স্পার্মিওজেনেসিস। শুক্রাণুর গঠন- শুক্রাণুর দেহ প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা– মস্তক, গ্রীবা, লেজ। (খ) উওজেনেসিস- যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননক্ষম মহিলার ডিম্বাশয় থেকে ডিম বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তাকে উওজেনেসিস বা ডিম্বাণু জনন প্রক্রিয়া বলে। উওজেনেসিস প্রক্রিয়াটি চারটি ধাপে সংঘটিত হয়। যথা- সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়, বৃদ্ধি পর্যায়, পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়, রূপান্তর পর্যায়। মানুষের ডিম্বাণুর গঠন- স্ত্রী জননকোষের নাম ডিম্বাণু। প্রতিটি পরিপক্ক ডিম্বাণুকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা- ডিম্বাণু ঝিল্লী, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম। ৪। নিষেক- যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে এদের হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমসোমবাহী নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটিয়ে ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমসোমবিশিষ্ট জাইগোট গঠন করে তাকে নিষেক বলে। নিষেক একটি বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়া। ৫। গর্ভধারণ/ইমপ্লান্টেশন- ফেলোপিয়ান নালি অতিক্রমকালে ব্লাস্টোসিস্ট গঠিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুতে পৌছার পর জোনা পেলুসিডা অবলুপ্ত হয় এবং নিষেকের ৬-৯ দিনের মধ্যে ব্লাস্টোসিস্টটি এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত বা রোপিত হওয়ার পদ্ধতিকে ইমপ্ল্যান্টেশন বলে। ৭। মানব ভ্রূণের পরিস্ফুটন- নিষেকের পর জাইগোট (Zygote) যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশু বা লার্ভায় পরিণত হয় তাকে পরিস্ফুটন বলে। ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের ধাপগুলো নিম্নরূপ- ১। ক্লিভেজ, ২। গ্যাস্ট্রুলেশন, (গ) অর্গানোজেনেসিস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। স্পার্মাটোজেনেসিস এর সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়ে-
i. জনন মাতৃকোষ বারবার বিভাজিত হয়
ii. কোষগুলোতে ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম থাকে
iii. স্পার্মাটোগোনিয়া তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i. ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। নিচের কোন তন্ত্রটি ভ্রূণীয় স্তর এন্ডোডার্ম থেকে তৈরি হয়?
(ক) স্নায়ুতন্ত্র (খ) রেচনতন্ত্র (গ) শ্বসনতন্ত্র (ঘ) রক্ত সংবহনতন্ত্র

৩। ভ্রূণের বিকাশের কোন মাসে শিশু দেখতে শুনতে পায়?
(ক) সপ্তম মাসে (খ) অষ্টম মাসে (গ) নবম মাসে (ঘ) ষষ্ঠ মাসে

৪। মানুষের শুক্রাণুর টুপীর মতো একটি গঠনকে কি বলে?
(ক) সেন্ট্রিয়োল (খ) অ্যাক্রোসোম (গ) মাইটোকন্ড্রিয়া (ঘ) কোষ আবরণী

৫। স্পার্মাটোজেনেসিসে সারটলি কোষ কোষ-
(ক) স্পার্মাটোগোনিয়া তৈরি করে (খ) স্পার্মাটোসাইট তৈরি করে
(গ) স্পার্মিওজেনেসিসে সাহায্য করে (ঘ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্পার্মাটোগোনিয়াকে পুষ্টির যোগান দেয়

পাঠ-৯.৪ গর্ভাবস্থায় সমস্যা ও করণীয় দিকসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে করণীয় দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	রক্তস্বল্পতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রি-এক্লাম্পশিয়া

গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা : প্রতিবছর গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতায় আমাদের দেশে বহু নারীর মৃত্যু হয়। গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে মা ও শিশু উভয়ের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই গর্ভকালীন সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা ও সঠিক পরিচর্যাই পারে মা ও শিশুর জীবন বাঁচাতে। গর্ভাবস্থায় মায়েদের কিছু সাধারণ সমস্যা ও করণীয় দিকসমূহ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। বমি ভাব ও বমি- এটা খুব সাধারণ সমস্যা এবং বলা হয় যে, এটা গর্ভধারণের প্রথম লক্ষণ। সাধারণতঃ হরমোনের তারতম্যের কারণে এমনটি হয়। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস এ সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে সকালের দিকে কারো কারো ক্ষেত্রে আরও বেশি সময় দেখা দিতে পারে। পরে আপনা আপনি এ সমস্যা দূর হয়। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. যে সব মায়েদের এ সমস্যা দেখা দেয় তাদের সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তেলবিহীন শুকনো খাবার যেমন- মুড়ি, খই, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে, খ. বারবার অল্প করে খেতে হবে, গ. খাবারের অন্ততঃ ৩০ মিনিট পর পানি খেতে হবে, ঘ. প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

২। রক্ত স্বল্পতা- অনেক সময় গর্ভাবস্থায় রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয়। এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম মাস থেকে ফলিক এসিড এবং ৩ মাসের পর থেকে আয়রন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে হবে, খ. আয়রনযুক্ত খাবার যেমন- কচু শাক, কলিজা, তেঁতুল, তরমুজ, ডিম ইত্যাদি খেতে হবে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন- আমলকি, লেবু, কাঁচামরিচ, পেয়ারা, আনারস এবং কাঁচা ফলমূল খেতে হবে।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য- গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা থাকে। খাবার গ্রহণ, প্রয়োজন মতো পানি পান না করা ও অনিয়মিত পরিশ্রমের ফলে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা, খ. প্রচুর পরিমাণ শাক সবজি ও টাটকা ফল খেতে হবে। যেমন- আম, কলা, গাছ পাকা পেয়ারা, খেজুর, পেঁপে, আপেল ইত্যাদি। এছাড়া দুধ, কলা, রুটি, ভাত খাওয়া যেতে পারে, গ. নিয়মিত ঘরের কাজ ও হাঁটা চলা করতে হবে, ঘ. প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইসবগুলের ভুষি খেতে হবে।

৪। গলা ও বুক জ্বালা- গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি এবং শেষ দিকে গলা ও বুক জ্বালা একটি সাধারণ সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. সহজপাচ্য খাবার বার বার অল্প করে খেতে হবে, খ. খাওয়ার পরপর শোয়া যাবে না। বেশি প্রয়োজন হলে মাথার নিচে দুটি বালিশ দিয়ে অর্ধশয়ন অবস্থায় শুতে হবে, গ. মশলাযুক্ত ভাজা খাবার পরিহার করতে হবে, ঘ. প্রচুর পরিমাণ পানি এবং সম্ভব হলে দুধ পান করতে হবে, ঙ. প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৫। অনিদ্রা- গর্ভাবস্থায় শেষের দুই - তিন মাস অনিদ্রার ভাব হয়। এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. বিকেলে হাঁটা, শোবার আগে গরম দুধ খাওয়া বা বই পড়া ইত্যাদিতে উপকার হতে পারে, খ. প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৬। খিল ধরা- গর্ভকালে কোন কোন স্নায়ুর উপর চাপ পড়লে গর্ভবতীর পা বা উরুতে খিল ধরতে পারে। গর্ভাবস্থায় ক্যালসিয়ামের অভাব হলেও এ রকম হতে পারে। এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. পা শরীর থেকে উঁচু জায়গায় রেখে শুলে অথবা পা ছড়িয়ে বসে পায়ে তেল মালিশ করলে বা বার বার গোটালে ও ছড়ালে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

৭। পিঠে ব্যথা- গর্ভের প্রথমাবস্থা থেকে এ কষ্ট অনেক সময় দেখা দেয় যা শেষের দিকে খুব বেড়ে যেতে পারে। এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. শক্ত বিছানায় ঘুমালে উপকার পাওয়া যেতে পারে, খ. শিরদাঁড়ায় ম্যাসেজ করা যায়, গ. হাঁটা

চলার সময় কোমরে বেল্ট ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়, ঘ. সামনে ঝুঁকে কোন কাজ করা যাবে না, ঘ. ভারী জিনিস উঠানো যাবে না।

৮। পায়ের শিরা ফুলে যাওয়া- অনেক সময় গর্ভবতী মায়ের শিরা ফুলে যেতে পারে।

এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো যাবে না, খ. পা তুলে বসতে হবে, গ. প্রয়োজনে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে, ঘ. প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৯। পা ফোলা- গর্ভাবস্থায় পা ফুলতে পারে। শরীরে লবণ বৃদ্ধির ফলে পায়ের গোড়ালি ফুলে যায় ও পানি জমে। শরীরে পানি জমলে বা শরীর ফুলে গেলে, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর রক্ত চাপ, প্রস্রাব পরীক্ষা করা ও ওজন দেখা উচিত।

এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. পা উঁচুতে রেখে বিশ্রাম নেওয়া, খ. খাবারের সাথে বাড়তি লবণ না খাওয়া, গ. প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

১০। বুক ধড়ফড় ও শ্বাস কষ্ট- গর্ভাবস্থায় হার্টের কাজ বেড়ে যায়। কারণ মা ও শিশু উভয়ের শরীরে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। এতে মায়ের রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। এসব কারণে বুক ধড়ফড় করে। জরায়ুর বৃদ্ধির ফলে ফুসফুসের ওপর চাপ পড়ে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. বিশ্রাম নিতে হবে, খ. একটানা হাটা ও কাজ করা যাবে না, গ. বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

১১। মূত্র নালির সংক্রমণ- গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া হতে পারে। এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. প্রচুর তরল পানীয় খেতে হবে, খ. প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

১২। জ্বর- গর্ভাবস্থায় খুব জ্বর হলে মা ও বাচ্চার উভয়ের জন্য খুব বিপজ্জনক হতে পারে। এরূপ হলে হাসপাতালে বা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

১৩। অর্শ- কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শ যদি একই সঙ্গে থাকে তবে তা গর্ভাবস্থায় বেড়ে যায়। সুতরাং পায়খানা পরিস্কার হওয়া দরকার। এ অবস্থায় দেরী না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

১৪। মাথা ব্যথা- অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্ষুধা এবং গরম লাগলে মাথা ব্যথা হতে পারে। এ কারণে এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

১৫। তলপেটে ব্যথা- জরায়ু ধীরে ধীরে বড় হয়ে এর আশে পাশের লিগামেন্টে টান পড়ার জন্য তলপেটে ও কুঁচকিতে হালকা ব্যথা হতে পারে। এ ব্যথা স্বাভাবিক। এ ব্যথা পাঁচ- ছয় মাসের দিকে হয়।

১৬। সাদা স্রাব- গর্ভাবস্থায় হরমোন ইস্ট্রোজেন ও রক্ত সরবরাহ বেড়ে যাওয়ার জন্য সাদা স্রাব বেড়ে যেতে পারে। ঢিলেঢালা পোশাক ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, সাদা স্রাবের সাথে যদি দুর্গন্ধ থাকে বা চুলকানি হয় তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

১৭। বারবার প্রস্রাবের বেগ- গর্ভের প্রথম তিন থেকে চার মাস এটি হওয়া স্বাভাবিক। প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া না থাকলে এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।

১৮। রক্তপাত- গর্ভকালীন সময়ে যে কোন ধরনের রক্তপাতই হতে পারে মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক। এক্ষেত্রে মাকে সাথে সাথে চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে। জরায়ু ছাড়া অন্য কোন স্থানে ডিম্বাণুর অবস্থান (Ectopic pregnancy) ছোট খাটো অভ্যন্তরীণ ঝামেলাসহ গর্ভপাত হতে পারে এ সামান্য একটি কারণে।

এছাড়াও আরো কিছু সমস্যা বিশেষ করে প্রথমদিকে মাথা ঘোরা, অরুচি, দুর্বল লাগা, আলসেমি লাগা, শেষের দিকে উঠতে বসতে বা শোয়া থেকে উঠতে কষ্ট লাগা। গায়ে মুখে বিশেষ করে গলায় কালো দাগ পড়া, পেটের চামড়া ফেটে যাওয়া বেশি পিপাসা লাগা বা ক্ষিধে পাওয়া এগুলো হতে পারে।

গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিল সমস্যা-

১। গর্ভপাত- যদি কোন কারণে গর্ভস্থ ভ্রূণ আটাশ সপ্তাহ বা সাত মাসের পূর্বে মাতৃগর্ভের বা জরায়ু থেকে বের হয়ে যায় তবে তাকে গর্ভপাত বা এ্যাবরশন বলে।

এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- ক. সন্তান সম্ভবা হলেই চিকিৎসকের কাছে পূর্বের সকল ইতিহাস খুলে বলতে হবে, খ. নিয়মিত চেকআপ জরুরী, গ. সন্তান সম্ভবা হওয়ার প্রথম দিকে রিকসা, বাস, ট্রাক, ট্রেন ইত্যাদির ঝাঁকুনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত, ঘ. টিউবওয়েল পাম্প করা, পানি ভর্তি ভারী বালতি তোলা, বাচ্চা কোলে নেওয়া ঠিক নয়, ঙ. ছোঁয়াচে অসুখ থেকে গর্ভবতী মাকে দূরে রাখতে হবে, চ. দোকান বা হোটেলের খাবার না খাওয়াই ভালো, ছ. প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

২। প্রি-এক্লাম্পশিয়া- প্রি-এক্লাম্পশিয়া গর্ভধারণের বিশ সপ্তাহ অর্থাৎ পাঁচ মাস পর থেকে দেখা দেয়।
এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত চেক আপের ব্যবস্থা করা। গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাবার ও বিশ্রাম নিশ্চিত করা।
৩। এক্লাম্পশিয়া বা গর্ভকালীন খিঁচুনী- এক্লাম্পশিয়া মূলতঃ প্রি-এক্লাম্পশিয়ার গুরুতর অবস্থা, গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এক্লাম্পশিয়া বা গর্ভকালীন খিঁচুনি।
এ সমস্যা সমাধানে করণীয় দিক- প্রসব পূর্ব বা গর্ভকালীন পরিচর্যা নিয়মিত রক্ত চাপ মাপা, প্রস্রাবে প্রোটিন যায় কিনা পরীক্ষা করা, হাতে পায়ে পানি ইত্যাদি পরীক্ষা করা। যেহেতু এক্লাম্পশিয়া হওয়ার আগে প্রি-এক্লাম্পশিয়া হয়। তাই প্রি-এক্লাম্পশিয়া প্রতিরোধ করা গেলেই এক্লাম্পশিয়া হবে না।
৪। প্রসবজনিত ফিস্টুলা- ফিস্টুলা হচ্ছে এক ধরনের অস্বাভাবিক নালি যার গায়ে কোষ কলা থাকে এবং যা আবরণী কলা দিয়ে আবৃত শরীরের যে কোন দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায়।
৫। পেরিনিয়াম ছিঁড়ে যাওয়া- যোনি মুখে ও পায়ু পথের মাঝখানের জায়গাটিকে পেরিনিয়াম বলে। পেরিনিয়ামে কোন আঘাতের ফলে ক্ষত বা ছিঁড়ে যাওয়াকে পেরিনিয়াম ছিঁড়ে যাওয়া বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	গর্ভাবস্থায় সমস্যা ও করণীয় দিক সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রতিবছর গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতায় আমাদের দেশের বহু নারীর মৃত্যু হয়। গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে মা ও শিশু উভয়ের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই গর্ভকালীন সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা ও সঠিক পরিচর্যাই পারে মা ও শিশুর জীবন বাঁচাতে গর্ভাবস্থায় মায়েদের কিছু সাধারণ সমস্যা । যেমন–১। বমি ভাব ও বমি, ২। রক্ত স্বল্পতা, ৩। কোষ্ঠকাঠিন্য, ৪। গলা ও বুক জ্বালা, ৫। অনিদ্রা, ৬। খিল ধরা, ৭। পিঠে ব্যথা, ৮। পায়ের শিরা ফুলে যাওয়া, ৯। পা ফোলা, ১০। বুক ধড়ফড় ও শ্বাস কষ্ট, ১১। মূত্র নালির সংক্রমণ, ১২। জ্বর, ১৩। অর্শ, ১৪। মাথা ব্যথা, ১৫। তলপেটে ব্যথা, ১৬। সাদা স্রাব, ১৭। বারবার প্রস্রাবের বেগ, ১৮। রক্তপাত, গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিল সমস্যা। যেমন– ১। গর্ভপাত, ২। প্রি-এক্লাম্পশিয়া, ৩। এক্লাম্পশিয়া বা গর্ভকালীন খিঁচুনী, ৪। প্রসবজনিত ফিস্টুলা ও ৫। পেরিনিয়াম ছিঁড়ে যাওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। গর্ভবতীর রক্ত স্বল্পতা দেখা দিলে কি ধরনের ট্যাবলেট খেতে হবে?
(ক) আয়োডিন (খ) আয়রন ও ক্যালসিয়াম
(গ) ভিটামিন (ঘ) জিঙ্ক

২। নিম্নের কোনটি গর্ভকালীন জটিল সমস্যার মধ্যে পড়ে?
(ক) এক্লাম্পশিয়া (খ) বমি বমি ভাব
(গ) কোষ্ঠ কাঠিন্য (ঘ) রক্ত স্বল্পতা

৩। জরায়ু ছাড়া অন্য কোন স্থানে ডিম্বাণুর অবস্থানকে কি বলে?
(ক) Ectopic pregnancy (খ) Ovulation
(গ) Eclamsia (ঘ) Abortion

পাঠ-৯.৫ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	ডায়ফ্রাম, ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটমি

গর্ভনিরোধক পদ্ধতি (Contraceptive methods) : সন্তানের জন্ম বিভিন্ন উপায়ে রোধ করা সম্ভব। বর্তমানে অনেক ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি আছে। পরিকল্পিত ও সুস্থ-সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি দম্পতিকেই জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি সম্পর্কে সকল তথ্য জানতে হবে এবং ভেবে-চিন্তে উপযুক্ত পদ্ধতিটি বেছে নিতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রনের বহুল ব্যবহৃত আধুনিক পদ্ধতিগুলো হলো-

অস্থায়ী পদ্ধতি (স্বল্পমেয়াদী)	বড়ি (Oral pill)- মহিলাদের জন্য কনডম (Condom) – পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ইনজেকশন (Injection)-মহিলাদের জন্য (তিন মাস মেয়াদী)। ডায়ফ্রাম (Diaphram) মহিলাদের জন্য (৬ ঘণ্টা মেয়াদী)। স্পঞ্জ (Sponge)-মহিলাদের জন্য (২৪ ঘণ্টা মেয়াদী)।
অস্থায়ী পদ্ধতি (দীর্ঘমেয়াদী)	আই ইউ ডি (Intrauterine device-IUD)- মহিলাদের জন্য (দশ বছর মেয়াদী)
স্থায়ী পদ্ধতি	ভ্যাসেকটমি(Vasectomy)- ছুরিবিহীন ভ্যাসেকটমি (পুরুষদের জন্য) টিউবেকটমি (Tubectomy)- লাইগেশন (মহিলাদের জন্য)

অস্থায়ী পদ্ধতি (স্বল্পমেয়াদী)

বড়ি (Oral pill)- এটি বিভিন্ন অনুপাতে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন মিশ্রণে তৈরি এবং মহিলাদের জন্য মুখে গ্রহণযোগ্য বড়ি। রজঃচক্রের ৫-২৫ তম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে বড়ি গ্রহণ করতে হয়। এটি একটি সর্বাধিক ব্যবহৃত জন্মনিরোধক পদ্ধতি কিন্তু অনেক মহিলার সাময়িক বমি বমি ভাব, ফোঁটা ফোঁটা স্রাব, উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধির মত উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

কনডম (Condom)- এটি পুরুষ ও মহিলাদের ব্যবহারের জন্য এক ধরনের পাতলা, লম্বাটে রবারের থলি। সঙ্গমের পূর্বে পুরুষের শিশ্নে বা মহিলার যোনিতে কনডমে আবৃত করে নিলে স্খলিত শুক্রাণু আর জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না।

ইনজেকশন- মহিলাদের জন্য (তিন মাস মেয়াদী)। বেশ কয়েকমাস যাতে গর্ভধারণ ঝুঁকি নিরাপদে এড়ানো যায় তার জন্য ইদানিং এক ধরনের ইনজেকশন আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকায় এর গুণগত মান উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

ডায়ফ্রাম (Diaphram)- এটি মিলনের পূর্বে জেলি বা ফোম সহযোগে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের সহায়তায় মহিলাদের যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং যৌন মিলনের পর অন্তত ৬ ঘণ্টা সেখানেই রাখতে হয়। ডায়ফ্রাম ব্যবহারে কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই, বরং জরায়ুর ক্যান্সার এবং যৌন রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

স্পঞ্জ (Sponge)- মহিলাদের জন্য (২৪ ঘণ্টা মেয়াদী)। এটি ভিজিয়ে যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং পর মুহূর্ত থেকেই কার্যক্রম হলে ২৪ ঘণ্টা অনবরত প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে।

অস্থায়ী পদ্ধতি (দীর্ঘমেয়াদী) : অন্তঃজরায়ু গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা (IUD)- এটি মহিলার জরায়ুর ভেতরে স্থাপনকৃত গর্ভনিরোধক পদ্ধতি যা IUD বা Intra Uterine Device নামে পরিচিত । এ ব্যবস্থায় পলিথিন, তামা, রূপা বা স্টেনলেস স্টিল নির্মিত একটি ফাঁস (Loop) জরায়ুর অভ্যন্তরে স্থাপন করলে তা জরায়ুর ভেতরে নিষিক্ত ডিম্বাণুর স্থাপনে বাঁধা দান করে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র কপার-টি (Copper-T) ব্যবহার প্রচলিত।

স্থায়ী পদ্ধতি

ক) ভ্যাসেকটমি (Vasectomy) : এ পদ্ধতিতে পুরুষের ক্ষেত্রে উভয় দিকের শুক্রনালির অংশকে কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণু বাইরে আসতে না পারে।

খ) টিউবেকটমি (Tubectomy) বা লাইগেশন (ligation) : এ পদ্ধতিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে উভয় দিকের ফেলোপিয়ান নালির অংশ কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অধিক সন্তানবতী বা যারা একেবারেই আর সন্তান চান না বা গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে অসুস্থ তাদের জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতিগুলোর একটি ছক প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

সন্তানের জন্ম বিভিন্ন উপায়ে রোধ করা সম্ভব। বর্তমানে অসংখ্য জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি আছে। পরিকল্পিত ও সুস্থ-সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি দম্পতিকেই জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি সম্পর্কে সকল তথ্য জানতে হবে এবং ভেবে-চিন্তে উপযুক্ত পদ্ধতিটি বেছে নিতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রনের বহুল ব্যবহৃত আধুনিক পদ্ধতিগুলো হলো- অস্থায়ী পদ্ধতি (স্বল্পমেয়াদী), অস্থায়ী পদ্ধতি (দীর্ঘমেয়াদী) এবং স্থায়ী পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্বল্প মেয়াদী অস্থায়ী পদ্ধতি?
(ক) আইইউডি (খ) কনডম
(গ) রিং (ঘ) টিউবেকটমি

২। নিচের কোনটি জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি?
(ক) ডায়ফ্রাম (খ) স্পঞ্জ
(গ) ভ্যাসেকটমি (ঘ) ইমপ্লান্ট

৩। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরুষদের বেলায় কোন পদ্ধতিটি কার্যকর ?
(ক) বড়ি (খ) রিং
(গ) কনডম (ঘ) আইইউডি

পাঠ-৯.৬ যৌনবাহিত রোগসমূহের লক্ষণ ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সিফিলিস, গনোরিয়া এবং এইডস রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস

যৌনবাহিত রোগ : যে সব রোগ যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সে সব রোগকে যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Disease, STDs) বলে। চিকিৎসাবিদ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংক্রমণের ফলে লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে রোগ (disease) বলে। যেহেতু অনেক সময় যৌনবাহিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না তাই এ অবস্থাকে যৌনবাহিত রোগ না বলে যৌনবাহিত সংক্রমণ (Sexually transmitted infections) বলে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাক না পাক সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো যৌনবাহিত রোগ নামেই বহুল পরিচিত। অনেক ধরনের যৌনবাহিত রোগ ও সংক্রমণ রয়েছে। কেবল নিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমেই এসব রোগ ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। নিচে ৩টি যৌনবাহিত রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইডস) এর কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হলো-

১। সিফিলিস (Syphilis)- সিফিলিস একটি যৌনবাহিত রোগ। এ রোগে দেহে দীর্ঘকালীন জটিলতা দেখা দেয় এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

রোগের কারণ ও সংক্রমণ- *Treponema pallidum* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়। এ জীবাণুগুলো গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বসবাস করতে পছন্দ করে। ফলে মুখ, পায়ুপথ ও যৌনাঙ্গকে এরা সহজেই বেছে নেয়। মূলত নারী পুরুষের সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। যে কোন ধরনের যৌন মিলনের মাধ্যমে এ রোগে এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রমিত হতে পারে। এছাড়া চুম্বনের মাধ্যমেও এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। রোগীর রক্ত গ্রহণের মাধ্যমেও এ রোগ হয়। আবার গর্ভাবস্থায় মায়ের সিফিলিস থাকলে ভূমিষ্ঠ সন্তান এ রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এক মাসের মধ্যে চামড়ায়- দৃঢ়, ব্যথাবিহীন, চুলকানিবিহীন ক্ষতের সৃষ্টি হয়। একে ক্যান্‌কার (Canker) বলে ধীরে ধীরে এটা বড় হয়ে ফোস্কা বা ঘায়ের মতো হতে থাকে। নারী ও পুরুষ উভয়ের দেহে এ রোগ হতে পারে। রোগ শুরুর দুই মাসের মধ্যে চিকিৎসা না নিলে এ ঘা সমগ্র দেহে ছড়াতে থাকে সে সাথে জ্বর ও মাথা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয় এবং শরীরের বিশেষ করে কুচকির (Groin) গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে যেতে থাকে। এ রোগ পায়ুপথ, ঠোঁট, মুখ, গলনালি, খাদ্যনালি এমনকি শ্বাসনালিতেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় কেউ যদি চিকিৎসা নিতে অবহেলা করে তবে রোগটি খুবই জটিল আকার ধারণ করে। তবে অনেকের ক্ষেত্রে রোগটি সুপ্ত অবস্থায় চলে যায় এবং বছর দুয়েক সুপ্ত থাকার পর ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। এভাবে চিকিৎসাহীন থেকে গেলে পুরুষাঙ্গের মাথায় বিশাল আকৃতির বিশ্রী ক্ষত বা ঘা হয়, অবস্থা আরো জটিল হয়ে এক সময় এ রোগ চোখ, স্নায়ুতন্ত্র , হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পরে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে, এমনকি রোগীটিকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

প্রতিকার

চিকিৎসা - প্রাথমিক পর্যায়েই সিফিলিসের চিকিৎসা করানো উচিত । চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পেনিসিলিন শ্রেণির ওষুধ সেবন অথবা ইনজেকশন গ্রহণ করলে এ রোগ সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী বা যৌনসঙ্গী উভয়েরই চিকিৎসা নেয়া উচিত অন্যথায় এর সংক্রমণ সঙ্গীর নিকট থেকে আবারও হতে পারে।

প্রতিরোধ- এ রোগের কোন প্রচলিত টিকা বা ভ্যাক্সিন নেই। অবাধ যৌন মিলন না করে সুস্থ জীবন যাপন ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলাই এ রোগ প্রতিরোধের উপায়। রক্ত দেয়া বা নেয়ার সময় যাতে পুরোনো সুঁই ব্যবহার না করা হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

২। গনোরিয়া (Gonorrhea)- গনোরিয়া একটি সাধারণ যৌনবাহিত রোগ। সমগ্র বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ২০০ মিলিয়ন লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই মারা যায়। তবে এ রোগ থেকে মারাত্মক জটিলতা দেখা দেয়। মহিলাদের থেকে পুরুষরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

রোগের কারণ ও সংক্রমণ- *Neisseria gonorrhoeae* নামক ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে গনোরিয়া রোগের জন্য দায়ী। *N. gonorrhoeae* নারীর জনন নালি (সারভিক্স, জরায়ু, ফেলোপিয়ান নালিসহ) এবং নারী ও পুরুষের ইউরেথ্রার মিউকাস ঝিল্লিতে সংক্রমণ ঘটায়। মুখ, গলা, চোখ ও পায়ুর মিউকাস ঝিল্লির এ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আক্রান্ত হয়। গনোরিয়া আক্রান্ত লোকের সাথে কেবল যৌন সংসর্গের মাধ্যমে এক দেহ হতে অন্যদেহে স্থানান্তরিত হয়। গর্ভকালীন জটিলতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়ে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। সংক্রমিত বিছানার চাদর বা তোয়ালে থেকে শিশুরা এরোগ দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে। ঘন বসতি এবং অপরিচ্ছন্নতা থেকে বাচ্চাদের গনোরিয়া হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

পুরুষদের ক্ষেত্রে: ১০-১৫% পুরুষ উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে। যাদের উপসর্গ দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে-

- প্রস্রাবের যন্ত্রণা, প্রস্রাবের তীব্র আকাঙক্ষা, ঘন ঘন প্রস্রাব করা।
- পরবর্তীতে মূত্রনালি দিয়ে মিউকাসের মতো নিঃসরণ আসে, দ্রুত তা পুঁজে পরিণত হয়।
- প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, সেমিনাল ভেসিকলের প্রদাহ এবং এপিডিডাইমিসের প্রদাহের সঙ্গে জ্বর হয়।
- মূত্রনালির অস্বাভাবিক সংকীর্ণতা ঘটতে পারে।
- দীর্ঘদিন সংক্রমণের কারণে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ, ত্বকে ক্ষত, সেপটিসেমিয়া, মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং হৃদপিণ্ডের ক্ষতি হতে পারে।
- সমকামীরা পায়ূপথের যৌনসঙ্গম করলে পায়ুপথ সংক্রমিত হয়ে মলনালিতে তীব্র ব্যথা হয় এবং রসে ভিজে যায়।

মহিলাদের ক্ষেত্রে: শতকরা ৫০-৭৫ ভাগ মহিলা উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে। যাদের উপসর্গ দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে-

- যৌনাঙ্গ সংক্রমণের কারণে যোনির ওষ্ঠে লাল, দগদগে ঘা হয়।
- যোনিপথে হলদে বা হলদে সবুজ বর্ণের স্রাব বের হয়।
- প্রস্রাবের যন্ত্রণা, প্রস্রাবের তীব্র আকাঙক্ষা, ঘন ঘন প্রস্রাব করা।
- তলপেটে ব্যথা হয়।
- ডিম্বনালিতে প্রদাহ হয় ।
- মাসিক অনিয়মিত হয় এবং তীব্র ব্যথা হয় ।
- পায়ুপথে সঙ্গম থেকে কিংবা নিজ যোনি থেকে পায়ুপথ সংক্রমিত হলে মলনালি পথে নিঃসরণ ও রক্তক্ষরণ হতে পারে।
- দীর্ঘদিন সংক্রমণের কারণে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ, ত্বকে ক্ষত, সেপটিসেমিয়া, মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং হৃদপিণ্ডে ক্ষতি হতে পারে।
- ডিম্বনালিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সারা জীবনের জন্য বন্ধ্যাত্ব ঘটতে পারে।
- মায়ের এ রোগ থাকলে শিশু অপথালমিয়া নিওন্যাটারাম (Opthalmia neonaterum) নামক চোখের প্রদাহ নিয়ে জন্ম নিতে পারে।

চিকিৎসা- বর্তমানে গনোরিয়ার অনেক ওষুধ বের হয়েছে। রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে। জটিলতাহীন গনোরিয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত একক মাত্রার উপযুক্ত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধ বেশ ভালো কাজ দেয়। সাধারণত পেনিসিলিন ব্যবহারে সংক্রমণ সেরে যায়। কিন্তু অন্যান্যক্ষেত্রে ৫০% পর্যন্ত সংক্রমণ পুরোপুরি পেনিসিলিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। একক মাত্রায় সিপ্রোফ্লোক্সাসিন গনোরিয়া চিকিৎসায় বেশ কার্যকর।

প্রতিরোধ- ১। নিরাপদ যৌন সঙ্গম করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি মেনে চলা, ২। বহুগামীতা পরিত্যাগ করা এবং অনিরাপদ যৌন মিলন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, ৩। যৌন মিলনে কনডম ব্যবহার করা, ৪ । আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ না

হওয়া পর্যন্ত কারও সাথে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা, ৫। আক্রান্ত রোগীর যথাসম্ভব দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

৩। এইডস (AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome)- AIDS হলো Acquired (অর্জিত) Immune (ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) Deficiency (ডেফিসিইয়েন্সি বা হ্রাস) Syndrome (সিনড্রোম বা অবস্থা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ বিশেষ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়াকে এইডস (AIDS) বলে। Human Immune Deficiency Virus, সংক্ষেপে HIV নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়। HIV ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের শ্বেত রক্ত কণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T4 লিম্ফোসাইট ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যায়। বর্তমান বিশ্বে AIDS একটি মারাত্মক রোগ। ২০০০ সালে বিশ্বে HIV আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ, এদের মধ্যে মারা যায় প্রায় ৩০ লক্ষ। আফ্রিকার দেশসমূহে HIV র আক্রমণ বেশি লক্ষ করা যায়।

ধারণা করা হয় বানরের দেহে এ ভাইরাসটি ছিল যা সর্বপ্রথম আফ্রিকায় বানর থেকে মানুষে স্থানান্তরিত হয় এবং পরে তা আমেরিকা, ইউরোপ তথা সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

AIDS এর বিস্তার- বিভিন্ন উপায়ে এইডসের ভাইরাস একজন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যেমন- নারী পুরুষের অস্বাভাবিক ও অসামাজিক যৌন আচরণ, সংক্রমিত সিরিঞ্জ ব্যবহার, সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ, সংক্রমিত মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী শিশু, সেলুনে একই ব্লেড বা ক্ষুর বিভিন্ন জনে ব্যবহার করা, দন্ত চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা গ্রহণকারী ইত্যাদি।

রোগের লক্ষণ- এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর শ্বেত রক্ত কণিকা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফলে রোগীর দেহ ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারাতে থাকে এবং নিচে বর্ণিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে -

- প্রাথমিক অবস্থায় দেহে জ্বর আসে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে জ্বর দীর্ঘায়িত হয়।
- দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি ফুলে যায় এবং শরীর শুকিয়ে যায় ও ওজন কমতে থাকে।
- পেটে ব্যথা হয় এবং খাবারে অনীহা সৃষ্টি হয়।
- ফুসফুসে জীবাণুর আক্রমণ ঘটে এবং বুকে ব্যথাসহ শুষ্ক কফ জমে।
- অস্থি সন্ধি সমূহে প্রচণ্ড ব্যথা সৃষ্টি হয় এবং দেহে জ্বালা পোড়া হয়।
- শ্বাস কষ্ট, জিহ্বায় সাদা স্তর জমা, ত্বকের মিউকাস ঝিল্লি বা যে কোন ছিদ্র থেকে রক্তপাত, ঘন ঘন ফুসকুড়ি, সার্বক্ষণিক মাথা ব্যথা এবং ক্রমশ স্মৃতি শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়।
- সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রোগী যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অন্ধত্ব প্রভৃতি একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে।

এইডস এর লক্ষণ নারী- পুরুষে প্রায় এক রকম হলেও নারী দেহে কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। যেমন- যোনিতে দীর্ঘস্থায়ী বা অনিরাময়যোগ্য ঈষ্টের সংক্রমণ। এ সংক্রমণ সুস্থ নারীদেহে দ্রুত সেরে যায়। জনন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সংক্রমণ জনিত প্রচণ্ড জ্বালা পোড়া ও ব্যথা সৃষ্টি হয়। জরায়ু গাত্রে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) এর আক্রমণে টিউমার হওয়া এবং পরবর্তীতে সারভিক্স ক্যান্সারে রুপ নেওয়া আরেকটি লক্ষণ।

প্রতিরোধ- এইডস প্রতিরোধে নিচে বর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত-

- নিরাপদ যৌন সঙ্গম করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি মেনে চলা।
- অনিরাপদ যৌন মিলন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।
- যৌন মিলনে কনডমের ব্যবহার এবং এইডস থেকে রক্ষায় এর ভূমিকা সম্পর্কে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- এইডস এর ভয়াবহতা সম্পর্কে রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, বিলবোর্ড, পোষ্টার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা।
- ইনজেকশন গ্রহণের সময় ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনরায় ব্যবহার না করা এবং শিরার মাধ্যমে কোন ড্রাগ গ্রহণ না করা।
- সেলুনে একটি ব্লেড একবারই ব্যবহার করা।
- সংক্রমিত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে সম্পূর্ণভাবে আলাদা রেখে চিকিৎসা প্রদান করা।

- পতিতাদের নিরাপদ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা।
- প্রতিবার মিলনকালে কনডম ব্যবহার করা প্রভৃতি।
- সতর্কতার সাথে নিজের শারীরিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতি খেয়াল রাখা।

চিকিৎসা- এইডসের চিকিৎসায় ৩ শ্রেণির ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যথা-

- রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে HIV র প্রতিলিপিকরণ ঠেকাতে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ এনজাইমকে বাধা দিতে Nucleoside analogue Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এ ওষুধে অস্থিমজ্জা সহ শারীরিক অনেক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
- Non-Nucleoside analogue Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ওষুধ খেলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে রোগী ওলটপালট স্বপ্ন দেখে, সবসময় নিদ্রালু থাকে প্রভৃতি।
- HIV এর জীবন চক্রের শেষ পর্যায়ে HIV Protease এনজাইমের কাজে বাঁধা দিতে Protease Inhibitors (PIs) জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। তবে জানা গেছে, HIV সংক্রমণ প্রতিরোধে কোন ভ্যাক্সিন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনাদের দৃষ্টিকোন থেকে এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত- তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে শিক্ষকের কাছে জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

যে সব রোগ যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সে সব রোগকে যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Disease, STDs) বলে। ৩টি যৌনবাহিত রোগ হলো- সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইডস। সিফিলিস একটি যৌনবাহিত রোগ। *Treponema pallidum* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়। গনোরিয়া একটি সাধারণ যৌনবাহিত রোগ *Neisseria gonorrhoeae* নামক ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে গনোরিয়া রোগের জন্য দায়ী। AIDS হলো Acquired (অর্জিত) Immune (ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) Deficiency (ডেফিসিইয়েন্সি বা হ্রাস) Syndrome (সিনড্রোম বা অবস্থা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ বিশেষ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়াকে এইডস (AIDS) বলে। Human Immune Deficiency Virus, সংক্ষেপে HIV নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিম্নের কোন উপায়ে এইডস সংক্রমণ সম্ভব নয়?

(ক) সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ
(খ) সংক্রমিত মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী শিশু
(গ) সেলুনে একই ব্লেড ব্যবহার করা
(ঘ) সংক্রমিত ব্যক্তির ত্বকীয় সংস্পর্শে

২। নিচের কোনটি সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীর লক্ষণ?

(ক) চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি
(খ) প্রস্রাবের যন্ত্রণা
(গ) মলনালিতে তীব্র ব্যথা
(ঘ) পেটে ব্যথা

৩। গনোরিয়া রোগ নিচের কোনটি দ্বারা হয়?

(ক) *Neisseria gonorrhoea*
(খ) HIV
(গ) *Treponema pallidum*
(ঘ) *Entamoeba histolytica*

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন : সালমা ও করিমের বিয়ের বয়স ১০ (দশ) বছর। তাদের চারটি কন্যা সন্তান হয়েছে। তারা আর সন্তান জন্ম দিতে চাচ্ছে না। তারা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে গেলে স্বাস্থ্যকর্মী তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতির যেকোনো একটি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ মতো সালমা ১০ (দশ) বছর মেয়াদি অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। এতে তারা দাম্পত্য জীবনে সুখী হলেন।

উদ্দিপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

ক. গর্ভনিরোধক পদ্ধতি কি?

খ. গর্ভনিরোধক স্থায়ী পদ্ধতির নাম লিখুন।

গ. উদ্দিপকে উল্লিখিত গর্ভনিরোধক অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর নাম লিখুন।

ঘ. উদ্দিপকে উল্লিখিত মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত গর্ভনিরোধক পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ :	১. গ	২.খ	৩.খ	৪.গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ :	১. খ	২.গ	৩.খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ :	১. ঘ	২.গ	৩.ক	৪.খ	৫.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ :	১. খ	২.ক	৩.ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ :	১. খ	২.গ	৩.গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ :	১. ঘ	২.ক	৩.ক		